Bodhsandha

13th Edition

December, 2014

অষ্টাদশ বর্ষ

ত্রয়োদশ সংখ্যা

ডিসেম্বর, ২০১৪

জে-১৮৬৭, চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লী-১১৯

প্রচ্ছদঃ সুদত্তা দে

বসন্ত

তনুকা ভৌমিক এন্দ

'বসন্তকাল এসেছিল বাইশ বছর বনের আঙিনায় গন্ধে বিভোর দক্ষিণ বায়

দিয়েছিল জলস্থলের মর্মদোলায় দোল্...'

হ্যাঁ, ঠিক এইভাবেই হয়েছিল ব্যাপারটা। শুধু আমার তখন বাইশ বছর নয় — আটচল্লিশ বছর বয়স। কিন্তু ঐ যে রবি ঠাকুর বলেছেন না, মর্ম-দোলায় দোল্? ছেলে হয়ে মেয়েদের মনের কথা এ ভাবে বুঝলেন কি করে কে জানে? গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ পেরিয়ে যখন আমার জীবনে হেমন্ত ছুঁই-ছুঁই, তখন কি করে যে শুকনো ডালে এমন কচিপাতা দেখা দিল?

ব্যাপারটা শুরু আমার চটির স্ট্র্যাপ ছেঁড়া দিয়ে। এক দিন সকালে অটো থেকে নেমে তাড়াহুড়ো করে অফিসের গেটের দিকে দৌড়তে গিয়েই ছিঁড়ল স্ট্র্যাপটা। এমনভাবে ছিঁড়েছে যে কিছুতেই ভাল করে পা টেনে এগোতে পারছি না। হঠাৎ শুনি, কি হল ম্যাডাম? সক্কাল সক্কাল অ্যাকসিডেন্ট?'

তাকিয়ে দেখি বছর তিরিশের এক যুবক হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। খুব চেনা লাগল মুখটা, মনে হল আমাদের সফটওয়্যার ডিভিশনের নয়। বোধহয় অ্যাডমিনের লোক হবে।

'আর বলবেন না' হাসার চেষ্টা করলাম।' এদিকে লেট হয়ে গেছে।'

'আমি তো আপনার পেছনের অটোতেই ছিলাম। দাঁড়ান, এক কাজ করি। পাশের গলিতে একটা মুচি বসে। ওর কাছ থেকে একজোড়া স্পেয়ার চটি এনে দিচ্ছি, আপনি পরে ঢুকে যান। সই করার পর্বটা সেরে নিন। পরে না হয় নিজের চটি কালেক্ট করে নেবেন।'

কিন্তু আপনারও তো কত তাড়া আছে? আমার জন্য এত কাণ্ড করবেন না —' খুবই অপ্রস্তুত হয়ে পাশের গলির দিকে রওনা হওয়ার জন্য ঘুরতেই ছেলেটি বেশ জোর দিয়ে বলল, 'আপনি দাঁড়ান - আমি এক্ষুনি আসছি।' বলে রওনা হল মুচির উদ্দেশে।

সেই আলাপ। নামটা বলেই ফেলি - সমর। বেশ হাসিখুশি চেহারা, লম্বা, মজবুত স্বাস্থ্য। ও সত্যিই আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেকশনে কাজ করে। দু'জনেই অটোতে আসতাম, আসতে যেতে মাঝে মধ্যে দেখা।

কখনও হয়ত দেখা হলে বলে উঠবে, 'বনানীদি, আজ তো একেবারে নীলাম্বরী! দারুণ দেখাচ্ছে।'

মুখে বেশি উচ্ছ্বাস দেখাতাম না, সেটা আমার স্বভাব নয়। কিন্তু মনে মনে খুশিই হতাম। খুব পছন্দ করেই কিনেছিলাম শাড়িটা, নীলের এই শেডটা বিশেষ দেখা যায় না। আর অমিতও তো সকালবেলা আমার পাশাপাশিই রেডি হয়ে অফিসে বেরিয়ে গেল। কই, একবারও তো শাড়িটা নজরও করল না!

অবশ্য অমিতের পছন্দ-অপছন্দের কোনদিনই বিশেষ প্রকাশ নেই। বাইশ-তেইশ বছর ঘর করছি একসাথে, আমি তা আশাও করি না। কিন্তু আমি আই.টি. প্রফেশনাল হলে কি হবে, সাহিত্য-গান-সিনেমা এ সবই আমার খুব প্রিয়। অমিত সিনেমা ভালবাসে না তা নয়, কিন্তু ও দেখবে খালি অ্যাকশান আর অ্যাডভেঞ্চার। ছেলেও সেই একই টেস্ট পেয়েছে। আর আছে দুজনের খেলা দেখার নেশা।

সমরের সাথে আলাপ একটু এগোতে দেখলাম নানা ব্যাপারে আমার সাথে ওর রুচির মিল আছে। কখনও সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্প তো কখনও ঋতুপর্ণ ঘোষের সিনেমা নিয়ে বেশ আড্ডা জমে উঠত মাঝে মাঝে।

আস্তে আস্তে অফিস যাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে বসে থাকতাম। আয়নায় নিজেকে খুঁটিয়ে দেখে খারাপ লাগত

না — এক সময় তো ভালই ছিল চেহারা। এখন একটু মেক-আপ দিয়ে রিপেয়ার করলে মাটামুটি চলে যায়। অপেক্ষা সমরের আলতো প্রশংসার। তাতেই দিনটা ঝলমলে হয়ে ওঠে, বসন্তের ফুলের গন্ধে মাতোয়ারা হয় চারদিক।

একদিন কম্পিউটারের সামনে বসে একটা ডি-বাগিং-এর কাজ শেষ করছি, হঠাৎ সমর পাশ দিয়ে যেতে যেতে গুন গুন করে গেয়ে গেল — 'একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি।'

একেবারে ঘেমে উঠলাম। চট করে ঘাড় ঘুরিয়ে সমরকে দেখছিলাম, হঠাৎ খেয়াল হল যে সামনের টেবিলের অর্পিতা আর কেয়া আমার দিকে তাকিয়ে কি যেন বলছে।

হিংসে করছে বোধহয়। দু'জনেই কম বয়সী, সুশ্রী অর্পিতা বিশেষ করে বেশ সুন্দরী। এমনিতে তো আমার দিকে ফিরেও তাকায় না, কারণ তিরিশের উপরে কেউ তো কথা বলারই যোগ্য নয়। আমিও অবশ্য অফিসে নিজের গাম্ভীর্য বজায় রেখে চলি। তবে দরকার হলে ওরা এসে মিষ্টি হাসি হেসে বলবে,

'বনানীদি, একটু হেল্প করে দেবে, প্লীজ?'

এখন বোধহয় ভাবছে, বাব্বাঃ এই আটচল্লিশ বছরের বনানীদি সমরের মত ইয়াং ছেলেকে তুক করল কিভাবে?

পরের দিন আর একটু যত্ন করে সাজলাম। হালকা হলুদ শাড়ি, ম্যাচিং কাঁথাস্টিচের ব্যাগ, কানে মাটির গয়না। অফিসেরসামনে দেখা হতেই প্রশস্তি।

'ব্যাস, ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত। ফাটাফাটি দেখাচ্ছে বনানীদি। অফিসের পর ডে আছে নাকি দাদার সঙ্গে?'

'ধ্যাৎ, কি যে বল!' কপট রাগ দেখাই আমি। 'তোমার দাদার সাথে আবার ডেট! যা বেরসিক!

'তবে কার সাথে যেতে চাও?' সমরের চোখে দুষ্টুমির ঝিলিক।

'ভেবে দেখি — আজ বিকেলে জানাব তোমায়' রহস্যময় হাসি ছুঁড়ে আমি এগিয়ে যাই আমার সেকশানের দিকে।

সেদিনই লাঞ্চের আগে টয়লেটে গেছি। দরজা খুলে বেসিনের দিকে যাব, তার আগেই শুনি দু-তিনটে গলা, চেনা গলাও আছে তার মধ্যে। কিন্তু যার জন্য থেমে গেলাম, টয়লেটের দরজা খুললাম না, তা হল আমার নিজের নামের উল্লেখ।

'বাব্বাঃ, বনানীদি সমরদার দিকে কি রকম ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকে দেখেছিস?' অর্পিতার গলা, সঙ্গে হাসি।

হেসে ওঠে কেয়াও। 'সত্যি, সমরদা যা কাণ্ডই করছে। আমার কিন্তু খারাপ লাগে বনানীদির জন্য। এত সিনিয়র...'

'থাম তো কেয়া! কিরকম এনজয় করছে দেখিসনি? দিনকে দিন সাজের বহরটা কিরকম বাড়ছে বল? সেদিন তা সমরদা আমার জন্য গান গাইতে গাইতে গেল, আর বনানীদি ভেবেছে ওর জন্য - মনে আছে?

'অ্যাই, আস্তে কথা বল' কেয়া সাবধান করে। 'কিন্তু সমরদাও বনানীদিকে এত পাত্তা দিচ্ছে কেন বল তো?'

'ও, তুই ব্যাপারটা জানিস না? আরে সমরদার দারুণ ইগো যে ও যে কোন মেয়েকে পটাতে পারে। তো কিভাবে জানি ওর বন্ধুরা ওকে চ্যালেঞ্জ করেছে যে বনানীদির মত কাঠখোট্টা মহিলাকে যদি তোর প্রেমে পড়াতে পারিস, তো মানব তোর ক্ষমতা আছে...'

অর্পিতা আর কেয়ার গলা মিলিয়ে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে দরজা খুললাম। হাত-পা কাঁপছে মুখের ভিতরটা শুকিয়ে গেছে। বেসিনে কল খুলে অনেকবার জলের ঝাপটা দিলাম মুখে। রাগে অপমানে মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করছে।

আয়নায় ভাল করে দেখলাম নিজেকে... হ্যাঁ আটচল্লিশই দেখাচ্ছে আমায়। একটা বছর কি একটা দিনও কম নয়। এখন একটাই চিন্তা, আবার সেকশনে ফিরে বাকী দিনটা কাটাব কি করে? সমরকে অর্পিতাকে ফেস করব কি করে? ভাগ্যিস লাঞ্চ-টাইমে সেকশন ফাঁকা। নিজের ব্যাগটা নিয়ে কোনমতে চুপচাপ বেরোলাম অফিস থেকে। ফোনে হাফ-ডে'র লিভ অ্যাপ্লিকেশন করে দিলেই হবে।

সোজা বাড়ি। আমার আশ্রয় — অমিত, বাবানের নিশ্চিন্ততা। নিরাপত্তা। বাড়িতে অবশ্য এখন কেউ থাকবে না। অমিত অফিসে, বাবানের স্কুল থেকে ফিরতে ফিরতে চারটে। যাক্‌গে, ভালই হয়েছে। নিজেকে একটু গুছিয়ে নেওয়ার সময় পাওয়া যাবে।

সোজা বেডরুমে গিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়লাম, ভেতরে রাগ-কান্না, অথচ চোখ দিয়ে এক ফোঁটাও জল বেরোল না। মাথা গরম - মনে হল ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকি — একটু সামলে উঠতে পারব তাহলে। শোবার ঘরের চারপাশের পর্দা টেনে ঘর অন্ধকার করেও দেখি অমিতের কম্পিউটারটা থেকে আলো আসছে। বিরক্ত লাগল, আবার ভুলে গেছে অমিত ওটা বন্ধ করতে।

বন্ধ করতে বসে হঠাৎ খেয়াল করলাম অমিত ওর ইয়াহু অ্যাকাউন্ট থেকে লগ আউট করতেও ভুলে গেছে। ইনবক্সে দেখি 'মিতা' নামে কার কাছ থেকে অনেক ই-মেল। মিতা, মিতা, মিতা... চেনা লাগছে নামটা। হ্যাঁ, বছর খানেক, বছর দেড়েক আগে বোধহয় অমিতের অফিসে জয়েন করেছিল। বছর সাতাশ-আটাশ বয়স হবে, যতদূর মনে পড়ছে। তার এত মেল অমিতের পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে কেন? মাথার ভিতরে প্রশ্নগুলো কিলবিল করতে থাকে।

যন্ত্রচালিতের মত আমার হাত ইনবক্সে সবচেয়ে নতুন মেলটা খোলে। সারি বেঁধে চলেছে অক্ষরগুলো — ঠিক যেন ছোট ছোট পিঁপড়ে।

আর কতদিন অপেক্ষা করব? বাড়ি থেকে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছে। কিন্তু একটা ডিসিশন তোমাকে নিতেই হবে...'

বুঝলাম মেয়েদের বসন্তকাল এক সময়ে বিদায় নিলেও ছেলেদের ক্ষেত্রে তার মেয়াদ আরও অনেক বেশি। কষ্ট পেলাম বেশি, নাকি রাগের পাল্লাটা ভারী হল? অভিমানে বুক ভেঙে গেল নাকি অপমানের জ্বালা অসহ্য হয়ে উঠল?

বুঝলাম না। আবারও মনে পড়ল রবি ঠাকুরকে —

'হৃদয়ের এ কূল, ওকূল দু কূল ভেসে যায়, হায় সজনী।'

আমার চোখ কিন্তু তখনও শুকনো।

কথার জাদুকর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

তনুকা ভৌমিক এন্দ

গদ্য রচয়িতা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে আমার এই লেখাটির পরিসর সংকীর্ণ, তাঁর 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসের প্রথম ভাগ। দেশভাগের প্রেক্ষাপটে লেখা এই সুবিশাল উপন্যাস তার ডানা বিস্তার করেছে ভারতবর্ষ ও এখনকার বাংলাদেশ বা তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের আকাশে।

এই উপন্যাসে রসের বৈচিত্র্য অফুরান, যেমন আছে হৃদয়স্পর্শী নানা ঘটনার সমাবেশ, তেমনই আছে এক খাস-বুনট লেখা ঐতিহাসিক পটভূমি, যা দাবী করে মননের।

উপন্যাসের শুরু প্রতাপ, তাঁর স্ত্রী মমতা ও তাদের পরিবারকে নিয়ে, যাঁরা দেশভাগের পর জমিজমা ছেড়ে বাধ্য হয়ে এসেছেন এ-পার বাংলায়। দেশের জমিদারী ও সচ্ছলতার স্মৃতি সততই তাড়ায় প্রতাপকে আর সেই স্মৃতি যেন চলতি জীবনের সমান্তরাল এক নদীর মত বইতে থাকে তাঁর জীবনে। এই পরিবারের বড় ছেলে পুকলু, পড়াশুনা ও স্বভাবের উৎকর্ষে যে ছিল সকলের আশা-ভরসা, হঠাৎ প্রাণ হারায়। এক আকস্মিক দুর্ঘটনায়। তার ছোট ভাই অতীন, এই গল্পের নায়ক। বুকের ভিতরে বয়ে চলে দাদাকে হারাবার যন্ত্রণা আর বাইরে নিজেকে ঢাকে রুক্ষ ব্যবহারের মোড়কে।

কলকাতায় ঘিঞ্জি পরিবেশে এক ছোট্ট ভাড়া বাড়িতে অতীনের বেড়ে ওঠা, কলেজ পাশ করা, ও ধীরে ধীরে নকশাল আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ার গল্পকে ঘিরে অনেক ডালপালা। তাতে আছেন প্রতাপের মা, বোন, বোনের পরিবার, অতীনের প্রেমিকা অলি ও তাদের বন্ধুমহল, সমাজ চেতন অথচ নিজের শারীরিক আকর্ষণ সম্বন্ধে উদাসীন চন্দ্রা যিনি হয়ে ওঠেন এক গুরু মা।

অন্যদিকে পূর্ব-পাকিস্তানে মূল শাখা হল প্রতাপের এক বাল্যবন্ধু মামুনের কাহিনী। মামুন দেশভাগের পক্ষে অথচ পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক চোখ-রাঙানি মেনে নিতে পারেন না। হিন্দু-মুসলমানের একসাথে মিলে গড়া ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে অস্বীকার করে মুসলমানের ধুতি পরাকে হিন্দু প্রথা বলে ছোট করে দেখতে পারেন না। একটি ছোট পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে লেখনীকে তিনি করেন তাঁর হাতিয়ার এবং তার জন্য তাঁকে জেলে যেতে হয়। পূর্ব-পাকিস্তানে ছড়ানো আরও নানা চরিত্র - মঞ্জু, আলতাফ, বাবুল, কামাল। এদের দিয়ে লেখক সুনিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন বাংলা দেশের জন্মলগ্নের আগের রাজনৈতিক দোলাচল।

পূর্ব-পশ্চিম উপন্যাসের পরিধি এতটাই বড় যে অবাক লাগে লেখক এত বড় - সাড়ে সাতশো পাতার উপন্যাস লেখার কাজে হাত দিলেন কি করে। কিন্তু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখার প্রসাদ গুণ সকলেরই জানা - এ যেন জোর করেই পাঠককে দিয়ে পড়িয়ে নেয়। এই সময় সম্পর্কে লেখকের পড়াশুনা, গবেষণা, বিশেষ করে পূর্ব-পাকিস্তানের অংশে, সহজেই চোখে পড়ে। সেখানকার গ্রাম-গঞ্জের সাথে তাঁর নিবিড় পরিচয়ও ধরা পড়েছে বইয়ের পাতায় পাতায়।

অন্যদিকে চরিত্র সৃষ্টিতেও লেখক দক্ষ। একদিকে যেমন চরিত্রবান প্রতাপের মনের অলিগলি দেখিয়েছেন, আবার তাঁর ভাইপো কানুর, যে কিনা যুদ্ধের কালো-বাজারের ফায়দা তুলে বে-আইনি ব্যবসা করে, তার চরিত্রও লেখনীর আঁচড়ে সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন।

তবে মনে হয়েছে নারী-চরিত্রের তুলনায় পুরুষ চরিত্র আঁকায় তাঁর দক্ষতা বেশি। মেয়েদের মনন ও মানসিকতা নিয়ে ভাবপ্রকাশে একটু গভীরতার অভাব বোধ হয়। বিশেষ করে তাদের দৈহিক আকর্ষণের প্রতি প্রাধান্য ও এ ব্যাপারে একই ধরণের বর্ণনা বারে বারে আসায় উপন্যাসের জোর কিছুটা কমেছে। প্রায়ই মেয়েদের গোলাপী ডুরে তাঁতের শাড়ি বা হলদে ডুরে শাড়ি পরে থাকার বর্ণনা একঘেয়ে লাগে। তবে মেয়েদের সম্বন্ধে আলোচনায় অতীনের মুখ দিয়ে যে দ্বিধার কথা বলা হয়েছে, তা মনে হয় লেখকের নিজের অভিজ্ঞতা - প্রসূত। মন-প্রাণ দিয়ে একটি মেয়েকে ভালোবাসা সত্ত্বেও কেন অন্য নারীর প্রতি আকর্ষণ আসে? এ কি পাপ?

সবশেষে দু-একটা ছোটখাট ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই, যেগুলো মনে দাগ কেটে গেছে। প্রতাপ একদিন অফিস - ফেরত বেহিসাবির মত এক বিরাট ইলিশ মাছ কিনে নিয়ে আসেন। যদিও তিনি মনে মনে জানেন রাত হয়েছে, গৃহিণী বিরক্ত হবেন, তা-ও পুরনো ইলিশ মাছ খাওয়ার স্মৃতি উদ্বেল হয়ে ওঠে তাঁর মনে। বাড়ি ফিরে সেই নিয়ে স্ত্রী মমতার সঙ্গে বাদানুবাদ, ছেলে-মেয়েদের মাছ খাওয়ার প্রতি অনীহা। রাগে দুঃখে মন ভেঙে গিয়ে ভাতের থালা ঠেলে ফেলে দেওয়ায় কি ভাবে তার পরিসমাপ্তি, তা সত্যিই পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে।

সে রকমই স্পর্শ করে তাঁর আত্মীয় ওস্তাদজী বিশ্বনাথের জীবনের ওঠা-পড়ার কাহিনী। অবস্থার প্রতিকূলতা ও নেশার দরুণ সদাহাস্যময়, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ভক্ত এই মানুষটিকে একদিন বাড়ির দালালি করে পেট চালাতে হয়। প্রতাপের বোন সুপ্রীতি একসময়ে লোকের চোখে চোখ রেখে কথা বলতেন, সাদরে অতিথিদের আপ্যায়ন করতেন অবস্থা পড়ার পর, বছরের পর বছর ছোট ঘরে ঘিঞ্জি পরিবেশে অভাবের সংসারে থাকতে থাকতে কিভাবে তাঁর মেরুদণ্ড নুয়ে পড়ে, নিজেকে আর অন্যদের সমকক্ষ ভাবতে পারেন না, তাদের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারেন না। লেখকের এই সংবেদনশীল বর্ণনায় চোখে জল এসে যায়। গোটা উপন্যাসের পাতায় পাতায় এই সংবেদনশীল মনের স্পর্শ আমরা পাই - এখানেই এই উপন্যাসের সার্থকতা।

গোয়া ফেরৎ

তনুকা ভৌমিক নন্দ

গোয়া রওনা হয়ে বেশ ফুরফুরে লাগছিল মনটা। কতদিন ধরে সবার কাছে গল্প শুনেছি, সকলেরই ভাল লেগেছে গোয়ার সমুদ্র সৈকত। প্লেনের জানলা থেকে নীল সমুদ্রের প্রথম দেখাতেই প্রেমে পড়ে গেলাম। স্বচ্ছ নীল সাগর রোদে ঝিকমিক করছে আর পাশে সাদা বালির আঁকাবাঁকা তীরে নারকেল গাছের সারি।

ছোট্ট এয়ারপোর্ট গোয়ার। চারপাশে স্থানীয় লোকেদের সাথে অনেক ট্যুরিস্ট। অনেকেই পরেছে শর্টস, টি-শার্ট, সঙ্গে মাথায় টুপি। স্থানীয় মেয়েরা পরেছে স্কার্ট আর ব্লাউস। আমাদের গন্তব্য 'নানু রিসর্টস-এর গাড়ি এসে গেছে ডাবলিম এয়ারপোর্টে। সুন্দর চওড়া রাস্তা ধরে বেশ কিছু দূর গিয়ে গাড়ী বাঁক নিয়ে ঢুকল ছোট রাস্তায়। দুধারে কখনও ধানক্ষেত, কখনও নারকেল গাছের সারি, মাঝে-মধ্যে দো-চালা বাড়ি। চারদিক গাছ-গাছালিতে সবুজ। শহরের থেকেও গ্রামের ভাবটাই বেশি। বাড়িগুলো একটু বিদেশী ধাঁচের - এক তলা সামনে লম্বা বারান্দায় বা 'পর্ট'। রাস্তার ধারে সাদা রঙের গির্জা — গোয়ার পর্তুগীজ প্রভাব নিশ্চয়ই।

নানু রিসর্টস-এ পৌঁছে চমৎকার লাগল। অনেকটা জায়গা জোড়া এই রিসর্ট, ভিতরে বেশ কয়েকখানি দোতলা কটেজ, বড় লন দোলনা, সুইমিং পুল, ইত্যাদি। দোতলায় আমাদের ঘরের বারান্দা থেকে দেখতে পাচ্ছি দূরে বালিতে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। কিন্তু তক্ষুনি বীচে যাওয়া গেল না — ভিতরে পুলেই সাঁতার কাটলাম। কারণ অক্টোবরের শেষেও বড্ড গরম।

বিকেলবেলা রিসর্টের গেট দিয়ে বেরিয়ে এক পা যেতেই সমুদ্র। বালিতে চটি বসে যাচ্ছ। লম্বা স্কার্ট পরে হাঁটতে গিয়ে বুঝতে পারছি, পা অবধি লম্বা পোষাক এখানে চলবে না। এক পা এক পা করে এগিয়ে, একেকবারে সমুদ্রের সামনে। অনেক দিন বাদে দু'কান ভরে নিই সমুদ্রের গর্জন। ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে সাদা ফেনায় ভেঙে একাকার। লুটিয়ে পড়া ঢেউ আবার ফিরে চলে যাচ্ছে কিন্তু পায়ের কাছে রেখে যাচ্ছে রঙ-বিরঙের ঝিনুক, কখনও জেলিফিশ। হলদে সাদা বালিতে বালিরঙের কাঁকড়া হালকা পায়ে প্রায় ভেসে চলেছে, কাছে গেলেই টুপ করে ঢুকে যাচ্ছে গর্তে।

অনেকক্ষণ হাঁটলাম সেদিন বালিয়াড়িতে। সমুদ্রের পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে এগোলাম কাছাকাছি 'কোলভা' বীচের দিকে। আগুনের গোলার মত রক্তিম সূর্য জলে ডুব দিলে বীচের আর এক রূপ। আশেপাশে সব কাঠের 'শ্যাক'-এ রয়েছে ছোট রেস্টুরেন্ট বা ধাবার মত খাবার জায়গা। সন্ধ্যা হতেই নানান আলোয় সেজে ওঠে তারা — সেখান ভীড় জমে ট্যুরিস্টদের। সামনে, বালিতে পাতা ডেকচেয়ারে বসে ফেনী বা ওয়াইনে চুমুক দিতে দিতে ট্যুরিস্টরা উপভোগ করে সামনে সমুদ্রের বুকে সূর্যাস্তের দৃশ্য।

রাত্রে ঘরে ফিরে প্ল্যান হল ভোরে উঠেই স্নান করতে হবে সমুদ্রে। সকালে বীচে গিয়ে দেখি এরই মধ্যে কয়েকজন বিদেশী-বিদেশনী নেমে পড়েছে জলে। কেউ আবার স্নানের পর সমুদ্রের পাড় ধরে হেঁটে যাচ্ছে কোলভা বীচের দিকে। আমরাও জলে নেমে প্রথমে একটু ধাওয়া কাবু হলেও শীগগিরই ভুলে গেলাম ধাওয়ার কথা। কখনও ঢেউয়ের ধাক্কায় নাকানি-চোবানি খাচ্ছি, কখনও হাত ধরাধরি করে গা ভাসিয়ে দিচ্ছি ঢেউয়ের দোলনায়। নোনতা জল আছড়ে পড়ে ভিজিয়ে দিয়ে সকলকে — যেন ফিরে গেছি ভুলে যাওয়া সেই ছোটবেলার দিনগুলোয়।

রিসর্টে ফিরে বেশ বড়সড় ব্রেকফাস্ট সেরে সারা দিনের নামে বেরিয়ে পড়া গেল। নানুরিসর্ট হল দক্ষিণ গোয়ায় এখানকার বীচে ভিড় কম। গোয়ার আরও বিখ্যাত বীচ - ক্যালাসুট, বাগা, অঞ্জুনা, সব উত্তর গোয়ায়। এর মাঝামাঝি হল পাঞ্জিম বা পানাজি, যেখানে গোয়ার প্রশাসনিক সব অফিস কাছারী।

গাড়ি নিয়ে উত্তরমুখী যেতে যেতে প্রথমে থামলাম 'ফোর্ট অ্যাগুয়াডা'-য়। আগুয়াডা মানে 'Watering Place' একটা পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। পনেরোশ শতাব্দীতে পর্তুগীজদের বানানো এই দুর্গ। দূরপাল্লার অনেক জাহাজ এখানে এসে থামত জল নিতে। গোয়াতে ১৫১০ সাল থেকে শুরু করে সাড়ে চারশো বছর ধরে চলেছিল পর্তুগীজ শাসন। তাই এখানকার ভাষা, ধর্ম, পোশাক, চালচলন সবেতেই পর্তুগীজ সভ্যতার ছাপ।

ফোর্ট অ্যাগুয়াডার সাদা লাইট হাউস, দুর্গের ভিতরে র‍্যাম্প, দুর্গের দেয়ালের ফাঁক দিয়ে দেখা দূরে সমুদ্রের বুকে ছোট ছোট জাহাজ দেখে মনে হচ্ছিল ছোটবেলায় পড়া এনিড ব্লাইটনের অ্যাডভেঞ্চারের বইয়ের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। জলদস্যুদের জাহাজ এই এল বোধহয়। ফোর্ট অ্যাগুয়াডাতেই নাকি হিন্দী সুপার হিট ছবি দিল চাহতা হ্যায়' — এর শুটিং হয়েছিল - সেই বিখ্যাত স্পটও দেখে নেওয়া গেল।

এরপর পরে আমরা রওনা দিলাম 'বাগা বীচ আর ক্যালাফুট বীচ দেখতে। খচাখচ ভীড়। তবে বীচে নানারকম 'ওয়াটার স্পোর্ট' — যেমন প্যারাশুট জাম্পিং সার্ফিং ইত্যাদির আকর্ষণও আছে। বীচের উপর খাবার হোটেলগুলোও জমজমাট, যেমন জমজমাট এখানকার বাজার। রংচঙে শর্টস, টি-শার্ট, সাঁতারের পোশাক, স্কার্ট, ঝিনুকের মালা, ঘর সাজানোর জিনিস কি নেই সেখানে। সেদিন গাড়ি নিয়ে গোয়ার মধ্যে ঘোরার সময়ে একটা মজার জিনিস চোখে পড়েছিল — পাড়ায় পাড়ায় তৈরি হচ্ছে রামলীলার রাবণের মত এক ভীষণাকৃতি রাক্ষস। পরে শুনলাম এর নাম 'নাটকাসুর', দিওয়ালীর সময়ে এই অসুর বানানোর প্রতিযোগিতা চলে।

বিকেলবেলায় আমাদের বেড়ানোয় জুড়ল আর এক মাত্রা মাণ্ডবী নদীর বুকে লাক্সারী ক্রুস। জাহাজের ডেকে বসে নদীতে বেড়ানো, নদীর পারে সূর্যাস্তের সাথে সাথে আকাশে কমলা আর গোলাপী বর্ণচ্ছটা, দূরে পাড়ে আলো জ্বলে উঠেছে, দেখা যাচ্ছে আলোর মালায় সাজানো সব জাহাজ। আমাদের প্যারাডাইস ক্রুস জাহাজে চলছে গোয়ার স্থানীয় নাচ-গান কখনও ট্যুরিস্টদের আহ্বান করা হচ্ছে স্টেজে উঠে নাচতে। সব মিলিয়ে অপূর্ব এক সন্ধ্যা — সত্যিই যেন প্যারাডাইস!

সেদিন রাতে সারাদিন হাঁটার ব্যথা মালুম পড়ছে কিন্তু ভাবছি — কি দারুণ ঘুরলাম। তখনও জানি না পরদিন সকালে কি অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করে আছে আমাদরে জন্য। সকালবেলা সমুদ্র-স্নান সেরে যেই না রিসর্টের দিকে এগোব, কোত্থেকে একটা নাদুস-নুদুস মিশকালো ছেলে এসে বলে, 'ওয়ান্ট টু সী ডলফিন?'

আমরা তো একপায়ে খাড়া। যদিও ছোট মোটববোটে ওঠার সময়ে একটু বুক দুরুদুরু করছে, কারণ সঙ্গে শুধু সেই কিশোর - রোশন — যার বয়স হবে বছর পনেরো, আর তার থেকে কয়েক বছরের বড় মোটর বোটের চালক। বোটে ওঠার পরেই প্রথম মজা। বিরাট ঢেউয়ের ধাক্কায় সবার জামাকাপড়, চশমা ভিজে একসা। কিন্তু পাড়ের দিকের বড় বড় ঢেউ কাটিয়ে এগোনোর পর চারদিকের জল নিস্তরঙ্গ। শুধু নীল আর নীল, সাদা ফেনায় ভেঙে পড়া ঢেউ সেখানে উধাও।

বোটের একদম সামনে দাঁড়িয়ে রোশন হাত-পা নাড়িয়ে দিক দেখাচ্ছে আর সেই অনুযায়ী চালক ঘোরাচ্ছে মোটর বোর্ট। হঠাৎ রোশন ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইশারা করে হৈ চৈ নয় — আর তার পরে একটু দূরে ডলফিন পরিবারের লাফ-ঝাঁপ। লাফ ঝাঁপ বললে তাদের grace বা সুন্দর ভঙ্গীর কথা বোঝানো যাবে না। দুটো ডলফিন

পাশাপাশি যেন নাচের ভঙ্গীতে জল থেকে মাথা তুলে আবার সারা শরীর বেঁকিয়ে জলে ডুব দিচ্ছে।

এদিকে আবার sea-snake কালো হলুদ ডোরাকাটা জলের সাপও নাকি উঁকি দিয়ে গেছে। এর মধ্যে অনেক ধবধবে সাদা sea-gullকেও ওড়াউড়ি করতে দেখেছি জলের উপর। পরে শুনলাম তাদের গতিবিধি দেখে নাকি ডলফিনদের ঠিকানা পাওয়া যায়। তার কারণ হল ডলফিনরা মাছের ঝাঁক খোঁজে আর সেই মাছে ভাগ বসায় সীগাল্‌রা। তাই এরা ডলফিনদের কাছে ওড়াউড়ি করে।

মোটরবোটের অন্য সঙ্গী - ডমিনিক - হঠাৎ জিজ্ঞেস করে — তোমরা যেখানে থাক, সেখানে ডলফিনকে কি বলে? তাকে তখন বোঝানো হল যে নয়ডাতে তো আর তোমাদের গোয়ার মত দরিয়া (সমুদ্র) নেই। তবে হ্যাঁ, কাছাকাছি গঙ্গায় platanista gangetica lingetica বলে ছোটমাপের ডলফিন দেখা যায়।

অকূল দরিয়ার নেশা কাটিয়ে উঠে এক সময় ফিরতে হয়। সেদিন নানু-রিসর্টের তরফ থেকে আমাদের গোয়া দর্শন। প্রথমেই ড্রাইভার নিয়ে গেল Ancestral Goa বলে এক জায়গায় যেখানে পর্তুগীজ আমলের গোয়ার ঝলক পাওয়া যায়। 'আলমেডা' নামে এক পর্তুগীজ সাহেবের পুরনো গাড়ি বেশ যত্ন করে রাখা আছে। জানা গেল সমাজে কার অবস্থার কতটা উঁচুতে সেটা নাকি বোঝা যেত বাড়ির ভিতরে উচ্চতা দিয়ে। বাড়ির ভিতরে সুন্দর পুরনো খাট আসবাব, আয়না, চেয়ার, সোফা, হ্যাট-স্ট্যাণ্ড, পালকি, পুজোর ঘর অনেক কিছু। মদ রাখার বড় বড় পিপে, বন্দুক রাখার জায়গা। রান্নাঘরের পিছনে কপিকল লাগানো কুয়ো এখনও আছে।

বিশেষ করে দুটো জিনিস খুব মজার লাগল। তখনও গোয়ায় কাঁচ পাওয়া যেত না — জানলায় তাই কাঁচের বদলে পালিশ করা ঝিনুকের খড়খড়ি লাগানো হত যাতে কিছুটা আলো ঘরের মধ্যে ঢুকতে পারে। আলমেডা সাহেবের টাকা রাখার ডেস্কও আকর্ষণীয়। এতে অনেক ছোট ছোট খুপরী প্রতিটাতে আলাদা মানের টাকা বা পয়সা রাখা থাকত। ঐ সময়ে ডাকাতের দল নাকি আগে থেকে খবর দিতো কোন দিন ডাকাতি করতে আসবে। সাহেব তখন টাকার ডেস্ক খালি করে রেখে বাড়ির বাইরে তাদের জন্য উপযুক্ত 'পারিশ্রমিক' রেখে দিতেন। ডাকাতরা সেই টাকা নিয়ে চলে যেত, ডাকাতি করতে আর আসত না।

পরের স্টপ 'স্পাইস গার্ডেন' বা মশলার বাগান। ভারী সুন্দর লাগল সেই বাগান। অনেক একর জুড়ে গাছ-গাছালিতে ভরা এই বাগানে ঢুকতেই ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে ও গলায় ফুলের মালা পরিয়ে আমাদের স্বাগত জানানো হল। তারপর 'হার্বাল' চা দিয়ে আপ্যায়ন ও সঙ্গে দেওয়া হল একটা কাজ যাতে নানা মশলার গুণ বিশদভাবে বর্ণনা করা আছে। এর পরে এক গাইডের সঙ্গে আমরা (কয়েকজন ভারতীয় আর অনেক রাশিয়ান) চললাম মশলার গাছ দেখতে। দালচিনি, এলাচ, ভ্যানিলা, কোকো, সুপুরি কত নিত্য ব্যবহারের মশলার গাছ দেখা গেল।

জঙ্গলের মধ্যে সরু পায়ে চলা পথে হাঁটতে বেশ অ্যাডভেঞ্চারের মত লাগছিল। এমন সময় একটা ছোট সাঁকোর উপর থেকে নীচে তাকিয়ে দেখি হাতীর পিঠে চড়ে বসে আছে এক মেমসাহেব আর হাতী ঝোরা থেকে শুঁড়ে জল নিয়ে তার গায়ে ঝরণার মত ঝরিয়ে দিচ্ছে - এই ন্যাচারাল শাওয়ার-এর তারিফ না করে পারলাম না!

আর এক জায়গায় গাইড বলল, 'দ্যাখো সুপুরি গাছে কেমন এক গাছ থেকে আর এক গাছে যাওয়া যায়, মাটিতে নামতে হয় না।' একজন লোক তা করে দেখিয়ে দিল। সুপুরী গাছের নমনীয়তার দরুণ তা অনেকখানি বাঁকানো যায়। তাই লোকটি একটা গাছে চড়ে, তাকে বেঁকিয়ে পাশের গাছ অবধি চলে গেল।

স্পাইস গার্ডেনের সুস্বাদু খাওয়া অনেকদিন মনে থাকবে। এখানে এসে এখানকার পানীয় ফেনীরও স্বাদ

পেলাম। আর উপহার পেলাম সুগন্ধি মশলার ছোট্ট এক প্যাকেট। স্থানীয় দুই মন্দির দেখার পর বিকেলে আমরা পৌঁছলাম পানাজীতে। সেখানে গোয়ার বিখ্যাত সেন্ট মেরী গির্জা যাকে বলা হয় Bom Jesus Basilica বা ছোট্ট যীশুর গির্জা।

সত্যিই পুতুলের মত ছোট্ট যীশু শোভা পাচ্ছে এই সুপ্রাচীন গির্জায়। গির্জার সামনেটাও দেখার মত, ঘাসের প্রান্তরে বিরাট সব গাছ ছায়া মেলে এক সুনিবিড় শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। গির্জার ভিতরে সোনালী রঙে কারুকার্যের বাহুল্য। সবথেকে বেশি চমক লাগায় সেন্ট ফ্রান্সিসের অপূর্ব প্রাচীন কফিন। সেখান থেকে নাকি পাঁচ বছর অন্তর সেন্ট ফ্রান্সিসের দেহ লোকসমক্ষে বার করা হয়, কারণ সেই মরদেহ নাকি এখনও অবিকৃত।

বম জিসাস চার্চের পাশেই বিরাট মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারী। আমাদের মিউজিয়াম দেখারই সময় শুধু হাতে ছিল। সেখান পুরোনো গোয়ার পর্তুগীজ পর্যটক, নৌবহরের সেনাপতি থেকে শুরু করে পরবর্তী কালের শাসকদের অয়েল পেন্টিং রাখা আছে। এছাড়া আছে সেই সময়কার স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলার নিদর্শন।

সারাদিন হেঁটে ক্লান্ত হলেও কাছাকাছি জনাপাওলা বীচে হেঁটে সমুদ্র দর্শন করে তবেই রিসর্টে ফিরলাম। আমাদের আস্তানা নানু রিসর্টে সেদিন নতুন ডাইনিং হল চালু হয়েছে তার সাথে গানের বন্দোবস্ত। বেশ লাগল গোয়ান যুবকদের এই ব্যান্ডের গান শুনতে। কিছু ইংরেজি, কিছু হিন্দী, গান শুনতে শুনতে টের পেলাম এদের ভাষার টানে এরা 'ত'কে বলে 'ট'। অতএব 'আ ইয়ে রুত্ মস্তানী' হয়ে যাচ্ছে 'আ ইয়ে রুট্ মস্তানী'!

দেখতে দেখতে গোয়া-ভ্রমণের দিন ফুরিয়ে এল। শেষ দিন একটু ভারাক্রান্ত মন নিয়েই করলাম কিছু কেনাকাটা। জানি পরদিনফিরে যেতে হবে সমুদ্র আর বালিয়াড়ির টান ছেড়ে। ভুলে যেতে হবে ঢেউয়ের গর্জন। সেই শেষ সন্ধ্যায় কোলডা বীচের থেকে সমুদ্রের ধার ধরে হাঁটতে হাঁটতে ফিরছি আমাদের নানু রিসর্টের দিকে। অন্ধকার হয়ে গেছে, চারদিকে শ্যাকগুলো রঙীন আলোর মালায় সাজানো, কিন্তু লোকালয় ছেড়ে একটু এলেই জমাট অন্ধকার। তখন সঙ্গী শুধু সমুদ্রের অবিশ্রান্ত ঢেউ ভাঙার শব্দ। অদ্ভুত লাগছে। বাস নেই, গাড়ি নেই, নেই লোকের ভীড়, নেই তীব্র আলোর ঝলকানি, শব্দের দূষণ।

অন্ধকার বীচে সমুদ্রের মুখোমুখি আমরা - পায়ের নীচে ঝুরো বালি আর পায়ের কাছে আছড়ে পড়া ঢেউ। ইচ্ছে করে, মুখ ফিরিয়ে নিই শহুরে জীবনের থেকে থেকেই যাই এখানে 'লোটাস-ইয়ার' হয়ে। কিন্তু জানি ফেরার পথ ধরতেই হবে। তবে এ-ও জানি, আবার আসব। আসতেই হবে। অতএব, 'গুডবাই গোয়া' নয়, 'অরভোয়া গোয়া'।